# যেন এক অলীক ভুবন

ABP March 31, 2018 P3

শিলাদিত্য সেন

রেবা রায়চৌধুরী সখেদে বলেই ফেললেন পি সি জোশীকে যে, সাংস্কৃতিক কাজকর্মের জন্যে তাঁরা আর রাজনৈতিক মিটিং-মিছিলে থাকতেই পারছেন না। তখন চল্লিশের দশক, পি সি জোশী কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি, আর রেবা রায়চৌধুরী সে পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন আইপিটিএ-র এক তুখড় কর্মী। তাঁকে সস্নেহে বোঝালেন জোশী, সাংস্কৃতিক প্রকাশেই মানুষের মন জয় করা যায় অনেক বেশি, সভা বা বক্তৃতায় ততটা কাজ হয় না। এই যে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের বিভিন্ন স্কোয়াড নানান জায়গায় গিয়ে তাদের নাচ-গান-নাটকের ভিতর দিয়ে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতার লড়াই, মেহনতি মানুষের বেঁচে থাকার কথা জানান দিচ্ছে, তা পার্টির যে-কোনও সভা-সমাবেশ বা বক্তৃতার চেয়ে শক্তিশালী।

একই ভাবে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে এসে আইপিটিএ-র সাংস্কৃতিক স্কোয়াডে যখন যোগ দিলেন প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, তখন তাঁকেও তানপুরার সঙ্গে ঠিকমতো রেওয়াজ করার কথাই খেয়াল করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, বলেছিলেন— ওটাই প্রধান কাজ। উষা দত্ত, শোভা সেন, বা তৃপ্তি মিত্রের *(ছবিতে)* জীবনের ছাঁচটাও অনেকটা এ রকমই, রাজনীতিই তাঁদেরকে টেনে নিয়ে এসেছিল সংস্কৃতির চৌহদ্দিতে। এঁদের সকলকেই প্রাণিত করতেন পি সি জোশী, কাঁধে পার্টির পতাকা তুলে নিলেই দেশসেবা হয়— এমন বিশ্বাসের বশবর্তী ছিলেন না কখনওই। মনে করতেন, সমাজের যে-কোনও মানুষই নিষ্ঠাভরে নিজ দায়িত্ব পালন করলে দেশ ও জাতির সেবা হয়, স্বাধীনতা পাওয়ার দিকে আরও এক পা এগিয়ে যাওয়া যায়।

টুকরো টুকরো স্মৃতি, আখ্যান, সাক্ষাৎকার দিয়ে নিজের বইয়ের এই অধ্যায়টি সাজিয়েছেন লতা সিংহ, নাম দিয়েছেন 'পলিটিক্যাল থিয়েটার অ্যান্ড উইমেন পারফরমার্স/ দ্য ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন'। তাঁর এই বইটি হাতে এল সম্প্রতি— *রেজিং দ্য কার্টেন/ রিকাস্টিং উইমেন পারফরমার্স ইন ইন্ডিয়া* (ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান), তাতে শুরুতেই একটু যেন অনুযোগই করেছেন লতা, মানবীবিদ্যাচর্চায় এখন চার পাশ সরগরম, অথচ সেখানে যাঁরা নাচ-গান-অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা কোথাও কমবেশি ব্রাত্য, ততটা ঠাঁই পান না মেয়েদের আবহমান ইতিহাসে, এমনকী মেয়েদের নিজস্ব লেখালিখিতেও। দূর থেকে তো বটেই, নিচু চোখেও দেখা হয় তাঁদের।

তৃপ্তি মিত্রের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেছেন লতা এই প্রসঙ্গে। গ্রামে গিয়েছে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের একটি শাখা। নাটক শেষ হয়ে যাওয়ার পর তৃষ্ণার্ত হয়ে একটি বাড়িতে গিয়ে জল খেতে চেয়েছেন

সঙ্ঘের মেয়েরা, আর সে বাড়ির মেয়েরা জানতে চাইছেন তাঁদের পরিচয়। পারস্পরিক আলাপের পাশাপাশি বাড়ির একটি মেয়ে একটি পাত্র থেকে জল এগিয়ে দিচ্ছিলেন, হঠাৎ তৃপ্তি মিত্র শুনতে পেলেন, বাড়ির ভিতর থেকে বয়স্ক এক পুরুষ চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলছেন: 'থিয়েটারের মেয়েদের সঙ্গে অত কথা কিসের?' এইটুকুতেই ক্ষান্ত হন না পুরুষটি, বলতেই থাকেন, 'আরে, এরা বেশির ভাগই হাটে-বাজারের মেয়ে, হাজার ঘাটের জল খায়, হাজার রকমের পুরুষের সঙ্গে এদের ওঠাবসা-মেলামেশা।' শুনে এতটাই ব্যথিত হয়েছিলেন তৃপ্তি যে কবরের তলায় চলে যেতে ইচ্ছে করেছিল তাঁর। শুধু নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসে ভর করে সে দিন মাটির উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, তাঁর রাজনীতিই তাঁকে নৈতিক দৃঢ়তা জুগিয়েছিল।

তৃপ্তি মিত্র তো সোজাসাপটা জানিয়েই ছিলেন যে তাঁরা থিয়েটার করতে নয়, দেশের কাজ করতে এসেছিলেন। বিশেষত তিনি নিজে কখনও ভাবতেই পারেননি, নাটকেই বাকি জীবনটা তাঁর প্রবাহিত হবে। দুর্ভিক্ষে পীড়িত মানুষগুলিকে বাঁচাতে এসেছিলেন, নাটক-করাটা তাঁর কাছে ছিল নিরন্ন মানুষের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার একটা রাস্তা মাত্র। এ জন্যে তাঁদের শাসকের নির্যাতনও কম ভোগ করতে হয়নি, এমনকী স্বাধীন ভারতেও। প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বামীকে নিয়ে বিয়ের পর উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন, কার্শিয়াং যাওয়া মাত্রই খবর আসে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার, পুলিশ প্রীতির স্বামীকে তিন মাস কার্শিয়াঙের জেলে রেখে দেয়। আর রেবা রায়চৌধুরী আদর্শগত ভাবে সজল রায়চৌধুরীকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করার পর জেলেও দিন কেটেছে তাঁদের।

স্বাধীনতার অব্যবহিতে নিত্যই এমন ঘটতে থাকত। সময়টা অন্য রকম ছিল, কমিউনিস্ট পার্টি তখনও ক্ষমতার মুখ দেখেনি, এখনকার মতো পার্টিতে তখন পচন ধরেনি। শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত সচেতন শিক্ষিত প্রতিবাদী মেয়েরা কমিউনিস্ট পার্টি বা আইপিটিএ-কেই তাঁদের লড়াইয়ের প্ল্যাটফর্ম মনে করতেন। লতা তাঁর বইয়ে স্বাভাবিক নিয়মেই বাংলার বাইরের মেয়েদের কথাও বলেছেন, যেহেতু তাঁর আলোচনার ক্ষেত্র সমগ্র ভারত। আমিই বরং বাঙালি মেয়েদের কথা বিশেষ ভাবে তুলেছি, তুলব নাই-বা কেন, ওঁদের কথা পড়তে-পড়তে যেন এক অলীক ভুবন ভেসে ওঠে চোখের সামনে। আবেগ? হবেও বা! ওঁরা যে ভাবে মানুষ আর সমাজের কাছে পৌঁছতে চেয়েছিলেন, তা একমুখী আর সরল মনে হয়েছিল তখন অনেকেরই, আজ ফিরে তাকালে তার জটিল বহুমুখিতা টের পাওয়া যায়। রাজনীতি আর শিল্পের হাত মেলানোর ভিতর দিয়ে তাঁরা ছুঁতে চেয়েছিলেন ভাঙাচোরা মানুষগুলিকে, সেই মানুষগুলির প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বেদনাময় অনুভূতিগুলিকে।

করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলে লেখা শেষ করি। না, তাঁর কথা লেখেননি লতা, হয়তো তাঁর জানা নেই। আমরাই-বা কতটুকু জানি অভিনয়ের পাশাপাশি তাঁর রাজনৈতিক লড়াইয়ের কথা? কেবল সর্বজয়া বলে চিনি তাঁকে, সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' ছবির আইকন। লতার বইটির সঙ্গে প্রায় একই সময়ে বেরিয়েছে তাঁর রচনাসংকলন *সর্বজয়াচরিত্র* ২ (থীমা)। সেখানে আইপিটিএ-র কর্মী হিসাবে নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন প্রয়াত অভিনেত্রী: 'কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হওয়ায় গণনাট্য সংঘের নাট্যস্বাধীনতাও ব্যাহত। কাজেই পুলিশের চোখ এড়িয়ে অভিনয় ও লুকিয়ে পালিয়ে রিহার্সাল এই ব্যাপারটাই আমার ভাগ্যে বেশি জুটেছে।' পাশাপাশি সে সময়টাকে কাটাছেঁড়া করতেও ভোলেননি করুণা: 'সমাজের সেই ছকে টানা নীতিজ্ঞান, মূল্যবোধ ও বিধিনিষেধের অঙ্কে অনেকটাই বেমিল দেখা দিয়েছিল। সেইজন্যেই গণনাট্য সংঘের নতুন চিন্তা ও নিরাভরণ চেহারার এতটা সাগ্রহ সমাদর সম্ভব হয়েছিল, যেমন সম্ভব হয়েছিল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের মেয়েদের পক্ষে রঙ্গমঞ্চে আসা।'

যে সময়টা জুড়ে গণনাট্যের কাজে নিয়োজিত ছিলেন করুণা, সে সময় তাঁর স্বামী সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নাশিক রোড সেন্ট্রাল প্রিজন-এ বন্দি, নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হওয়ার অপরাধে। বাবার সঙ্গে দেখা করানোর জন্যে মেয়েকে নিয়ে মাঝেমধ্যেই সেখানে যেতে হত করুণাকে। আসন্ন ডিসেম্বরে একশোয় পা দেবেন তিনি, ১৯১৯-এ জন্ম, রুশ বিপ্লবের ঠিক দু'বছর পরে।